Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
UGC Approved, Journal No: 48666
Volume-VII, Issue-III, January 2019, Page No. 21-27
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

অদ্বৈত মল্লবর্মণ ও তিতাস পারের মালো সমাজ

ড. নীতিশ দাস
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, মার্ঘেরিটা মহাবিদ্যালয়, মার্ঘেরিটা, তিনসুকিয়া, আসাম, ভারত

Abstract

Adwaita Mallabarman is one of the renowned novelists of modern Bengali Literature. In his fiction, he focuses his attention to the village life. 'Titash Ekti Nadir Nam' is one of the best novels in Bengali related with the life of the fisherman and others living largely based on river. In the capitalist society it has been observed that the subaltern group works very hard but they are very much under privileged and deprived of the minimum opportunities of life. The middleman snatches away the profit from these poor men and they remain poor throughout their lives and this way they carry the burden of debt from one generation to other. Even then they have their own dreams, expectation from life, and struggle for emancipation which has been portrayed in vividly in Adwaita Mallabarman's writings.

In this paper, the main emphasis is being given on the way of living or life style of the subaltern people. The analysis will be basically on how the subaltern space is being deprived from other spaces. As they don't spend their lives as the other classes of the people do. They are considered as neglected and they are not allowed to enjoy their lives in full swing. They are being stopped or hindered in some or other way. The objective of the study is to make a critical analysis of the life style of the backward communities as portrayed by the author largely based on his own experience (as the author himself belongs to the backward and fishing community).

Keywords: Village life, Fisherman, Capitalist Society, Under Privileged, Deprived, Subaltern.

'তিতাস একটি নদীর নাম' এই কালজয়ী উপন্যাসের লেখক অদ্বৈত মল্লবর্মণ ১৯১৪ সালের ১লা জানুয়ারি অবিভক্ত ত্রিপুরা রাজ্যের ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের গোকর্ণগ্রামে (বর্তমান বাংলাদেশে) জন্মগ্রহণ করেন। জন্মলগ্ন থেকেই তাঁর তিতাসের সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তাঁর মার নাম সারদা, পিতা অধরচন্দ্র মল্লবর্মণ পেশায় ছিলেন একজন মৎস্যজীবী। সমাজের তৎকালীন ভদ্র ব্যক্তিরা গোকর্ণগ্রামের মালোপাড়াকে বলতেন 'গাবর পাড়া' এবং যথাসম্ভব তারা মালোদের সংসর্গ এড়িয়ে চলতেন। বলাবাহুল্য অদ্বৈত মল্লবর্মণ সাহিত্য রচনার রসদ তিতাস তীরের জনপদ থেকেই সংগ্রহ করেছিলেন। জীবনের প্রায় প্রথম কুড়ি বছর ব্রাহ্মণবাড়িয়ার গোকর্ণঘাটে অতিবাহিত করেন।

অদ্বৈত মল্লবর্মণের পড়াশুনার সূত্রপাত ঘটে ব্রাহ্মণবাড়িয়া মাইনর স্কুল থেকে। তারপর ব্রাহ্মণবাড়িয়া এম. ই. স্কুলে পাঠ শেষ করে তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া এডওয়ার্ড হাইস্কুলে ভর্তি হন। ১৯৩৩ সালে অন্নদা হাইস্কুল থেকে প্রথম বিভাগে মাট্রিকুলেশন পাশ করেন, যদিও এ নিয়ে গবেষকদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে তিনি কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে পড়তে গিয়েছিলেন। প্রথমাবস্থায় মালোজনগোষ্ঠীর লোকেরা আর্থিক সাহায্য করে অদ্বৈতের পড়াশুনার পথকে মসৃণ করে তুলতে প্রয়াসী হয়েছিলেন।

বাল্যকাল থেকেই অদ্বৈতের মনে পড়াশুনার প্রতি আগ্রহ দেখা যায়। স্কুলে থাকাকালে বিভিন্ন ধরণের কবিতা লিখে দেয়াল পত্রিকায় ছাপিয়ে ছাত্র-ছাত্রী, বন্ধু-বান্ধবদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কবিতা ছাড়াও তিনি গল্প প্রবন্ধ লিখে নানা পুরস্কার লাভ করেন। একই সঙ্গে তিনি বিভিন্ন ধরণের বিতর্ক প্রতিযোগিতায়ও অংশগ্রহণ করতেন। সমসাময়িক সার্থক সাহিত্য কর্মের মধ্যে জারিগানের খালিফা'র কথা উল্লেখ করতেই হয়। উল্লেখ্য যে এ ক্ষেত্রে তিনি পিতার পদানুসরণ করেন। অধরচন্দ্রের মধ্যে যে শিল্পরসের ধারা প্রবাহিত ছিল তা-ই যেন অদ্বৈত মল্লবর্মণ বহন করে নিয়ে আসেন।

উচ্চশিক্ষার জন্য ১৯৩৩ সালে কুমিল্লা শহরে অবস্থিত ভিক্টোরিয়া কলেজে ভর্তি হলেও আর্থিক দূরাবস্থার জন্য অদ্বৈত মল্লবর্মণের পক্ষে পড়াশুনার ব্যয় বহন করা সম্ভবপর হয়ে উঠেনি। তাই জীবিকার সন্ধানে তিনি ১৯৩৪ সালে কলকাতার উদ্দেশ্যে পাড়ি দেন। "*কলকাতা এসে অদ্বৈত মল্লবর্মণ প্রথমে যোগ দেন 'ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভা'র মুখপাত্র 'ত্রিপুরা' পত্রিকার সাংবাদিক হিসাবে। তিনি সম্পাদনা ও সাংবাদিকতার কাজ একসঙ্গে করতেন। ঐ সময় তিনি তাঁর পড়াশুনার নিবিড় পাঠকে কেন্দ্রায়িত করেন লোকসংস্কৃতিকে মূল ভাবনায় রেখে। সময় সমাজ ও প্রগতির সঙ্গে তিনি লোকসংস্কৃতিকে মিশ্রিত করেছিলেন। 'ত্রিপুরা' পত্রিকায় তিনি ত্রিপুরাকে নিয়ে কবিতা লিখেছিলেন।*"[১]
এছাড়াও প্রথমে 'নবশক্তি' পত্রিকার সহ-সম্পাদক এবং কিছুদিন পর ১৯৩৮ সালে সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। আলোচ্য পত্রিকা ছাড়াও 'মোহাম্মদী' 'আজাদ' প্রভৃতি পত্রিকার সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল। 'নবশক্তি' পত্রিকায় লেখকের স্বনামে ও বেনামে কিছু লেখা প্রকাশিত হয় যদিও বেনামে প্রকাশিত সব প্রবন্ধ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। আবার 'মোহাম্মদী' পত্রিকাতে যখন কাজ করতেন সে সময়েই ১৩৫২ সালের শ্রাবণ থেকে মাঘ মাসে অদ্বৈতের বহুচর্চিত 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসটি সাতটি সংখ্যায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। সে পত্রিকাতে আলোচ্য উপন্যাস ছাড়াও অদ্বৈত মল্লবর্মণের আরও কিছু লেখা প্রকাশিত হয়। 'চয়নিকা পাবলিসিং হাউস' প্রকাশন থেকে অদ্বৈতের জীবিতকালীন একমাত্র গ্রন্থ 'ভারতের চিঠিঃ পার্ল বাককে' ১৯৪৩ সালে প্রকাশিত হয়। ১৩৪৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'দলবেঁধে' গ্রন্থের সম্পাদনা করেন অদ্বৈত মল্লবর্মণ এবং আলোচ্য গ্রন্থের মধ্যে লেখকের 'স্পর্শদোষ' গল্পটি স্থান লাভ করে। 'দেশ' পত্রিকার সহকারী সম্পাদকের কাজ অদ্বৈত মল্লবর্মণ নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন।'দেশ' পত্রিকায় অদ্বৈত মল্লবর্মণের Irving Stone-এর (ভ্যান গখের জীবন নিয়ে লেখা) 'Lust for Life' -এর অনুবাদমূলক উপন্যাস 'জীবনতৃষা' ১৯ মার্চ ১৯৪৯ থেকে ২০ মে ১৯৫০ প্রর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। সে সময় অদ্বৈত মল্লবর্মণের আরও কিছু লেখা 'দেশ'-এ বের হয়। 'শাদাহাওয়া' উপন্যাসটি 'সোনারতরী' পত্রিকায় ১৩৫৫ বঙ্গাব্দে শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ১৩৭১-এর বৈশাখ থেকে চৈত্র সংখ্যায় 'চতুষ্কোন' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয় 'রাঙামাটি' উপন্যাসটি। পরবর্তীকালে এই দুটি উপন্যাসই 'প্রায় সম্প্রতি' গ্রন্থ হিসেবে প্রকাশিত হয়। তাঁর মৃত্যুর পর শ্রীদেবীপ্রসাদ ঘোষের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় তাঁর নির্বাচিত প্রবন্ধের একটি সংকলন গ্রন্থ, 'বারমাসী গান ও অন্যান্য' নাম দিয়ে। 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসটি প্রথম গ্রন্থাকারে পুঁথিঘর থেকে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তিনি রচনা করেছেন অনেক প্রবন্ধ, ছোটগল্প, কবিতা ও উপন্যাস। কিন্তু পাঠক হৃদয়ে তিনি আসন করে নিয়েছেন এই বহুচর্চিত উপন্যাস 'তিতাস একটি নদীর নাম' -এর জন্যই। এখানে আমরা উল্লেখ করতে পারি আলোচ্য উপন্যাসটি তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা কারণ এই মহৎ সৃষ্টির সঙ্গে জড়িয়ে আছে তাঁর জীবন। শৈশব থেকে তিতাস নদীর তীরে লালিত হয়েছেন তিনি, সেই নদীর অপরূপ মহিমা এবং তার তীরবর্তী মানুষের বাস্তব জীবনকে স্বভাবতই নিখুঁত ভাবে তুলে ধরেছেন এই উপন্যাসে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে প্রথম নদীকেন্দ্রিক উপন্যাস রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। তাঁর জনপ্রিয় ও বহুচর্চিত উপন্যাস 'পদ্মানদীর মাঝি' প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে। তার ঠিক এগারো বৎসর পর তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা করেন 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা'। অর্থাৎ যে সাহিত্যধারার সূত্রপাত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল সেই সাহিত্যধারায় আরও সংযোজন করলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, অমরেন্দ্র ঘোষ, অদ্বৈত মল্লবর্মণ, সমরেশ বসু আরও অনেক সাহিত্যিকেরা।

উপন্যাসের শুরুতেই লেখক নদীর সঙ্গে জীবনের তুলনা করেছেন। নদী যেভাবে ভাঙা-গড়ার মধ্যদিয়ে লক্ষস্থলে উপনীত হয় মানুষও সেভাবে ভাঙতে ভাঙতে গড়তে গড়তে নিজের জীবন নির্মাণ করে এগিয়ে চলে। কালপ্রবাহ-জলপ্রবাহ এবং মানুষের জীবন প্রবাহের এক দার্শনিক তত্ত্বকেই সামনে রেখে লেখক আলোচ্য উপন্যাসের পরিকাঠামো তৈরি করেছেন। অদ্বৈত মল্লবর্মণের রচনাশৈলীতে নদী কেন্দ্রীয় চরিত্র রূপে ধরা দিয়েছে। আলোচ্য উপন্যাসে লেখক অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে মালোদের সমাজজীবনকে চিত্রিত করেছেন। তিতাস নদীর কোলে লালিত পালিত এই জনজীবন তিতাস পারের সংস্কৃতিতে পুষ্ট। মালোদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ তিতাসের উপর নির্ভরশীল। লেখক নিজে মালো সমাজের অন্তর্ভুক্ত বলে মালোদের আঁতের কথাকে হৃদয় দিয়ে অনুধাবন করে জ্ঞানের পরিধিকে লেখনীর মাধ্যমে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ করেছেন। আর সেজন্যই বিশ শতকের এক ব্যতিক্রমী সৃষ্টি হয়েছে 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসটি।

মেঘনা বা পদ্মার সঙ্গে তিতাসের স্বভাবের তুলনা করা ন্যায়সঙ্গত নয়। বড় বড় নদীতে যেভাবে তুফানের প্রকোপ থাকে সে তুলনায় তিতাস একেবারে তুফানের প্রকোপ মুক্ত। আর সেজন্য কাল বৈশাখীর দিনেও মালোরা তিতাস নদীর বুকে মাছ ধরতে গেলেও পরিবারের মানুষেরা নিশ্চিন্ত মনে থাকতে পারে। মালো পরিবারের লোকজন ভাবে,-"*তিতাসের বুকে ঝড়-তুফানের রাতেও স্বামী-পুত্রদের পাঠাইয়া ভয় করে না। বউরা মনে করে স্বামীরা তাদের বাহুর বাঁধনেই আছে, মায়েরা ভাবে ছেলেরা ঠিক মায়েরই বুকে মাথা এলাইয়া দিয়া শান্তমনে মাছভরা জাল গুটাইতেছে।*"[২]

তিতাস নদীর সঙ্গে মালোদের জীবনের বাঁধন একসূত্রে গাঁথা। জন্মের পর থেকেই মালোরা নদীকে দেখে আসছে। যেহেতু তিতাস নদী তাদের খোরাক যোগায় তাই নদীকে নিয়ে তাদের আশা, আকাঙ্ক্ষা, উদ্দীপনা কোনোদিন শেষ হয় না। নদী ছাড়া মালোদের অবস্থা জলবিহীন মাছের মতো। ঔপন্যাসিকের ভাষায়,-"*তাদের দিনে রাতের সাথী বলিতে এই নদী। এই মনের অলিতে গলিতে তাদের অবাধ পথ-চলা। এর নাড়ি-নক্ষত্র তাদের নখদর্পণে। কাজেই স্রোতের একটুখানি আড় টিপিয়াই বুঝিতে পারে কোথায় এর ব্যাধি ঢুকিয়াছে। বুঝিতে পারে এর বুকের কাছেই কাছেই কোথাও খুব বড় একটা চর ভাসিতেছে।*"[৩]

তিতাস নদীর গুরুত্ব সেভাবে ইতিহাসকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়নি। কারণ তার নেই কোনো ইতিহাস, তিতাস তীরে মোগল-পাঠানের মহারণের নেই কোনো চিহ্ন, মগদের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের রক্তরঞ্জিত দাগের ছিটে এসে পড়েনি, বৃটিশ স্থাপত্যের কোনো সৌধ বুক ফুলিয়ে জয় পতাকাকে কালজয়ী করে রাখতে অসমর্থ। অর্থাৎ নদীর মধ্যেও অপাংক্তেয় অবহেলিত তিতাস নদী। আর অবহেলিত নদীর চিরঅবহেলিত বাসিন্দা হল মালোরা। তিতাস নদী যেখানে ধনুকের মতো বাঁক ধরেছে সেখান থেকেই গ্রাম শুরু হয়েছে, আর গ্রামের দক্ষিণ পাড়াতেই মালোদের বাস। চিত্রকর যেভাবে তুলির টানে রঙের কারুকার্যে নিজের সব চিন্তাধারাকে চিত্রের মধ্যে বাস্তবায়িত করেন, অদ্বৈত মল্লবর্মণও সেভাবে নিজের আত্মোপলব্ধিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মালোসমাজের মাধ্যমে মর্মব্যথাকে ভদ্র সমাজের কাছে তুলে ধরেছেন। মালোদের আচার-আচরণ, বিশ্বাস-সংস্কার, পোষাক-পরিচ্ছদ, উৎসব-অনুষ্ঠান, ক্রিয়া-কর্ম, ক্রীড়া-ভাষা কোনোকিছুই তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। তিতাসের ঘাটে নৌকা বাঁধা, মাটিতে জাল ছড়ানো, উঠানের কোণে গাবের মটকি, ঘরে ঘরে চরকি, টেকো, তকলি-সূতা কাটার, জাল বোনার

সরঞ্জাম –এসব হল মালোদের সম্পত্তি, মালোদের পরিচয়, মালোদের গৌরব, মালোদের অস্তিত্ব –আর তাকে নিয়েই তাদের সংসার গড়ে ওঠে। কথায় বলে বারো মাসে তেরো পার্বণ, মালোরা নিজের আচার অনুষ্ঠান, সংস্কৃতিকে যথাসম্ভব মেনে চলে। সংস্কৃতি জাতির মেরুদণ্ড, নিজের সংস্কৃতির বিসর্জন মানে জাতির অস্তিত্বের সংকট। মালোরা নিজের সংস্কৃতিকে ধরে রাখার আপ্রাণ প্রয়াস করে। উপন্যাসে আছে যে মাঘমাসের শেষে মালো ঘরের কুমারীরা মাঘ মণ্ডলের ব্রত পালন করে। যদিও মালো পরিবারের কুমারীরা অরক্ষণীয়া হওয়ার সুযোগ পায় না। কারণ মালো মেয়েদের পুতুল খেলার বন্ধনে যতি পরার পূর্বেই পারিবারিক বন্ধনের যোগসূত্রে তারতম্য ঘটে। তবুও মাঘমণ্ডলের ব্রত পালনে তাদের আগ্রহ কোনোদিন কমে না।

জীবনের চরমতম সত্য মৃত্যু –মালোরা মৃত্যুকে ভয় করে না, আর মালোদের জীবনকে আড়াল করে মরণ সবসময় হাত বাড়িয়ে থাকে। মালোজীবনে মৃত্যুর হাতছানি আমরা 'গঙ্গা' উপন্যাসেও দেখতে পাই। সমরেশ বসু 'গঙ্গা' উপন্যাসে মালোদের জীবনচিত্র এঁকেছেন আর অদ্বৈত মল্লবর্মণও মালোদের জীবনচিত্রকে চিত্রিত করেছেন, কিন্তু উভয় উপন্যাসের মালো সম্প্রদায়ের মধ্যে সাদৃশ্যের সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা বৈসাদৃশ্যও পরিলক্ষিত হয়। তিতাস পারের চিত্রায়নে অদ্বৈত মল্লবর্মণ যেন হৃদয় উজাড় করে নিজের ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে চিত্রকে প্রাণচঞ্চল করে তুলেছেন। মালোজীবন জলকে ছাড়া বাঁচে না, তাদের জীবিকা, তাদের অস্তিত্ব সবকিছুই জলের উপর নির্ভরশীল। সমাজের তথাকথিত ভদ্রনামধারী ব্যক্তিরা হয়তো মালোদের ভালোলাগা, মন্দলাগা, দুঃখ, দুর্দশা, মালোজীবনের তাৎপর্য ঠিকমতো হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে না। ভাগ্যের উপর নির্ভর করে মালোদের জীবন, তাই তাদের জীবনের সংশয় কোনোদিন শেষ হয় না। বিবাহ যেভাবে তাদের মনে সুখের স্বপ্নকে দোলায়িত করে, বিবাহের পরিণাম বা পরিণতি সেভাবে দুঃখের বোঝা নিয়ে আসে। জন্ম-মৃত্যুর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জন্মকেই সেখানে হার মানতে হয়। প্রতিনিয়ত এখানে মারা যায় নবজাতক শিশুরা, -"*তখন তার মূল উপড়াইয়া পড়িয়া না যাইয়া উপায় কি? সেরূপ ফলের জন্যেও মানুষের ক্ষোভ নাই। সেরকম তরুর জন্যেও মানুষের রোদন নাই।*"[৪]

তিতাস পারের মানুষের (যা দাম্ভিক মানুষের কাছে যৎসামান্য কিন্তু মানবতার বিচারে মহৎ) মধ্যে নেই অর্থের প্রতিস্পর্ধা, নেই শক্তি সামর্থ্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, নেই বংশ কুলের অহংকার, নেই নাম যশের আত্মাভিমান। আছে সাধারণ মানুষের অসাধারণ প্রেম-প্রীতি-ভালবাসার নিবিড় বন্ধন। যদিও হিংসা, ঘৃণা, বিদ্বেষ, জীঘাংসা তাদের হৃদয় থেকে চিরতরে নির্বাপিত হতে পারেনি। তথাপি তারা মানবতার জয়গানে পিলসুজের মত সমাজকে আলো দেখিয়ে নিজেরা অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে জীবন অতিবাহিত করে। নদীর সঙ্গে মালোদের আত্মিক সম্পর্ক। জমিলা-কাদির-উদয়তারা-অনন্তবালা-অনন্তের সম্পর্ক যেন গ্রথিত হয়ে যায় নদীর সঙ্গে। নদীর গতিময়তা আর অনন্তের চঞ্চল মন একই ধারায় প্রবাহিত। বসন্তের বাতাস শুধু নদীর জলকে এসে ধাক্কা মারে না, হৃদয় বসন্তের সমীরণে কিশোরের মনও দোলায়িত হয়ে তাক ধিন, তাক ধিন করতে থাকে। নদীর মতো তার বুকও নেচে ওঠে। তার সঙ্গে নদীর মধ্যে সূর্যের সোনালী আভা কিশোরের উন্মনা আনন্দের রঙকে আরও প্রগাঢ় করে তুলে। মালোদের নিয়ম নীতি আচার অনুসারে কিশোর শুকদেব পুরের এক মেয়েকে বিয়ে করে। কিন্তু দাম্পত্য জীবনের সুখ ভোগ বিধাতা হয়তো তার কপালে লেখেনি। শুকদেবপুর থেকে ফেরার পথে সে নববিবাহিতা বধূকে হারিয়ে পাগল হয়ে যায়।

তারপর অদ্বৈত মল্লবর্মণ 'নয়াবসত' খণ্ডে চার বছর পরের কাহিনিকে তুলে ধরেছেন। এখানে আমরা উল্লেখ করতে পারি 'পথের পাঁচালী'-র অপুর মধ্যে যেভাবে বিভূতিভূষণের প্রতিচ্ছবিকে দেখতে পাই সেভাবে 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে অনন্ত চরিত্রের মধ্যদিয়ে লেখক নিজ সত্তাকেই উন্মোচিত করেছেন। প্রথমে নৌকাতে উঠে অনন্ত আজ যেন আত্মহারা। মালোর ছেলে হিসেবে গাঙ দেখার, নদীর বুকে মাছ মারার, রাত জেগে নদীতে ভেসে ভেসে ঘুরে বেড়ানোর শখ যেন তার স্বভাবসিদ্ধ অধিকার। মায়ের সঙ্গে অনন্ত মালোপাড়ায় এসে যখন আস্তানা গাড়ল তখন মালোসম্প্রদায় তাদেরকে স্বাদরে গ্রহণ করে নিল। মালোরা নিজেদের উদ্যোগে জঙ্গল কেটে ভিটের ব্যবস্থা করে নতুন ঘর তৈরি করে দিল। কথাকারের ভাষায়, -"*এ গাঁয়ে একজন নূতন বাসিন্দা আসিয়াছে,*

খবরটা যারাই পাইল তারাই খুশি হইল। মালোপাড়ার সবচেয়ে যে ধনী ছিল, তারই গিন্নি কালোর মা ছেলেদের বলিয়া একখানা পোড়া ভিটি কমদামে ছাড়িয়া দিল, ছেলেমেয়েরা হৈ চৈ করিয়া তার আগাছা সাফ করিল, তারপর পাড়ার পাঁচজনে মিলিয়া তার উপর একখানা ঘর তুলিয়া দিল।"[৫]

শোষক-শোষিতের সম্পর্কের মধ্যে দুর্বলেরা কিভাবে চৌতরফা আক্রমণে নাজেহাল হয় তার ইঙ্গিত পাই আমরা আলোচ্য উপন্যাসে। মধ্যসত্ত্বভোগী দালালের রক্তচক্ষুকে মালোরা ফাঁকি দিতে পারে না। সমাজের উচ্চবর্গীয় অর্থে বলীয়ান মানুষদের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ানোর ক্ষমতা মালোদের নেই। গ্রাম থেকে মাছ কিনে শহরে গিয়ে তা বিক্রি করলে ভার পিছু দু'আনা করে জমিদারের লোককে মাশুল দিতে হয় মালোদের। চিরকালের শোষণ রীতির সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শুধু কায়া পরিবর্তন হয়, স্বভাবসিদ্ধ চরিত্রের কোনো হেরফের হয় না। একই সঙ্গে সমাজের ছুৎমার্গের ব্যাপারটিও ঔপন্যাসিকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি,-"*তামসীর বাপের কানে এসকল কথা ঢুকিতেছিল না। সে নিজের কথা ভাবিতেছিল। এই বৈঠকে তার কথাও উঠিবে। মনে মনে সে নিজেকে অপরাধী স্থির করিয়া রাখিল। সত্যই ত, পাড়ার মধ্যে ঐক্য রাখা ও পাড়ার স্বার্থ দেখাই সর্বাগ্রে কর্তব্য। তারা আমার কে? তারা মালোদের ঘরে নেয় না, মালোরা কোনো জিনিস ছুঁইলে সে জিনিস তারা অপবিত্র মনে করে। পূজা-পার্বণে মালোরা তাদের বাড়ির প্রসাদ খাইলে এঁটো পাতা নিজে ফেলিয়া আসতে হয়। সে পাতা ওরা ছোঁয় না, জাত যাইবে। এরা মালোদের কত ঘৃণা করে। মালোরা লেখাপড়া জানে না, তাদের মত ধুতি-চাদর পরিয়া জুতা পায়ে দিয়া বেড়ায় না। কিন্তু তাই বলিয়া কি তারা ছোঁওয়ারও অযোগ্য? মালোরা মালো বলিয়া কি মানুষ নহে।"*[৬]

স্কুলের সঙ্গে মালো সমাজের আকর্ষণের চেয়ে বিকর্ষণের মাত্রাই যেন সুদৃঢ়। মালো সন্তানেরা কোনোদিন স্কুলের মুখ দেখে না, বা দেখলেও বেশিদূর অগ্রসর হতে পারে না। পারিবারিক অভাব-অনটন, সাংসারিক দুর্বলতা, সামাজিক দায়বদ্ধতার অভাব, সর্বোপরি নিজের ভালো-মন্দের বিচারে অজ্ঞতা স্কুলের সঙ্গে নিজেদের বন্ধনকে ধীরে ধীরে শিথিল করে একেবারে নিশ্ছিন্ন করে দেয়। স্কুলের নাম শুনলেই বলে উঠে,-"আর ইস্কুল। মালোরা পুলকে বাঁচেনা, তারা দিব ইস্কুল।" যদিও স্কুলের সঙ্গে তাদের অহিনকুল সম্পর্ক কিন্তু মালোদের কৌম সংস্কৃতি নিজেদের মধ্যে ধরে রাখার আপ্রাণ চেষ্ঠা করে। রামপ্রসাদ-বাহারুল্লা সবাই মিলে জারিগানের আসর জমিয়ে বীরের নাচ নাচত। এসব গানের মাধ্যমে তারা আত্মতৃপ্তি পায়, এবং নাগরিক সভ্যতার কালবৈশাখী ঝড় থেকে নিজেদের সংস্কৃতিকে বাঁচানোর ব্যর্থ প্রয়াস করে।

ব্রাহ্মণ্যবাদী ভাবাদর্শের আসল স্বরূপকে অদ্বৈত মল্লবর্মণ তাঁর বকলমের মধ্যে ফুটিয়ে তোলার চেষ্ঠা করেছেন। উপন্যাসে দেখতে পাই বুরুজ চৈত্র বৈশাখের রৌদ্রের তাপে দগ্ধ হয়ে পিপাসাকাতর অবস্থায় এদিক ওদিক তাকিয়ে কোনো নদী, নালার সন্ধান না পেয়ে অসহায় অবস্থায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এক ঘরে গিয়ে উপস্থিত হয়। সেই ঘরের কন্যার কাছ থেকে জল গ্রহণ করার পর বুরুজ জানতে পারে সে ঘর ব্রাহ্মণের নয়, এক ভুঁইমালীর- তখন সে নিজের কৃতকর্মের জন্য বিলাপ শুরু করে। ঔপন্যাসিকের মতে,-*"পিপাসাকাতর বুরুজ-জল খাইয়া শান্ত হইয়া, জিগাস করে তুমি কোন্ জাতের মাইয়া, (বলে) জাতে আমরা গন্ধভুঁইমালী। বুরুজের জাতি গেল, হায়, হায়, ব্রাহ্মণ বুরুজের জাতি গেল। আগে পরিচয় জিজ্ঞাসা না করিয়া যার হাতের জল সে পান করিল, সে ত ব্রাহ্মণের মেয়ে নয়। সে ছোট জাতের মেয়ে -আছাড় খাইয়া বুরুজে কান্দে, পিছাড় খাইয়া বুরুজে কান্দে, জাতি গেল ভুঁইমালিয়ার ঘরে। বুরুজের জাতি গিয়াছে। সে কি করিবে? না গেল প্রবাসে না গেল দেশে ফিরিয়া, যেখানে তাহার জাতি নষ্ট হইল, সেখানেই সে রহিয়া গেল, আর বলিয়া দিল -সঙ্গের যত সঙ্গীয়া ভাই, কইও খবর মা বাপের ঠাঁই জাতি গেল ভুঁইমালিয়ার ঘরে।"*[৭]

মালোদের কাছে উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ কায়েতেরা গুরুদেব তুল্য, সমাজের দিকদর্শক। মালোরা বুঝতে পারে বামুন কায়েতেরা শিক্ষিত লোক, মালোদের চেয়ে তাদের জ্ঞান বুদ্ধি বেশি। দুর্বলের প্রতি সবলের চিরাচরিত আগ্রাসনের এখানেও কোনো হেরফের হয় না। নিম্নবর্গীয় মালোদের শায়েস্তা করার জন্য উচ্চবর্ণের বামুন কায়েতেরা বিভিন্ন

ধরণের টোপ দিয়ে পিঞ্জরাবদ্ধ করার কূটকৌশল রচনা করে। তামসীর বাপের ঘরে উচ্চবর্ণের লোকেরা যে ভাবে আড্ডা জমায়, আসলে তাদের আক্রমণের লক্ষবস্তু ছিল মালোদের কৌম সংস্কৃতি। মালোরা অনন্যোপায় হয়ে কায়েতের দোকান থেকে জিনিস আনে, আর দেনার দায়ে ধীরে ধীরে সুদের জালে জড়িয়ে পড়ে। বামুন কায়েতেরা ষড়যন্ত্র করে মালোদের বিয়ে-শাদিতে টাকা ধার দেয়, আর মালোরাও চিরতরে বশীভূত হয়ে দাসত্বের বেড়িকে গলায় জড়িয়ে রাখে। মালোদের কাছে বামুন কায়েতের বাণী মানেই ব্রহ্মার লেখ। যদিও মালোদের মধ্যে বাসন্তীর মতো দু-একজন বিরোধ করার ব্যর্থ প্রয়াস করে, কিন্তু তার পরিণাম হয় আরও ভয়ঙ্কর। বামুন কায়েতেরা সবাই মিলে সম্মিলিত প্রচেষ্ঠায় মালোদের জব্দ করার প্রয়াস আরও তীব্রতর করে তুলল। 'সেদিন হইতে মালোপাড়ার আকাশে একখণ্ড কাল মেঘ ভাসিয়া থাকিল। কেউ জানিল না তার ছায়া কালক্রমে কতখানি আতঙ্কের বিষয় হইয়া দাঁড়াইবে।' মালোদের ঐক্যবদ্ধতাই তাদের রক্ষা কবচ ছিল, যেদিন তাতে ফাটল দেখা দিল সেদিন হতেই শুরু হল তাদের দুঃসময়ের সূত্রপাত। আগে তাদের মধ্যে ব্রজের মত দৃঢ় ঐক্য ছিল, মালোরা নিজেদের কৌম সংস্কৃতির সুদৃঢ় গাঁথুনির লক্ষণ রেখার মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধ ছিল। সমাজের উচ্চবর্ণের লোকেরা যাত্রাদলের মাধ্যমে সেই ঐক্যে ফাটল ধরিয়ে দেয় –"*যাত্রাদলের যারা পাণ্ডা, তারা অর্থে ও বুদ্ধিতে মালোদের চেয়ে অনেক বড়। তারা অনেক শক্তি রাখে। কিন্তু এক সঙ্গে সর্বশক্তি প্রয়োগ না করিয়া, অল্পে অল্পে প্রয়োগ করিতে লাগিল। যেদিন বিরোধের সূত্রপাত হইয়াছিল তার পরের দিন তারা তামসীর বাপের বাড়িতে আরও জাঁকিয়া বসিল। এতদিন ছিল শুধু তবলা, এবার আসিল হারমনিয়াম, বাঁশি ও বেহালা। গীতাভিনয়ের তিন রকমের তিনটা বই আসিল। আগে কেউ নামও শুনে নাই এমনি একটা পালার তালিম দেওয়া শুরু হইল। তামসীর বাপ আগে সেনাপতি সাজিত, তাকে দেওয়া হইল রাজার পাঠ। জানাইয়া দিল মালোপাড়ার ছেলেদের তারা সখীর পাঠ দিবে। অভিভাবকেরা ছেলেদের যাত্রাদলে যোগ দিতে নিষেধ করিল। তারা বিড়ি খায়, ঘাড়-কাটা করিয়া চুল ছাঁটে, গুরুজনের সামনে বেলাহাজ কথা বলে। ঠাকুর দেবতার গান ছাড়িয়া পথঘাটে সখীর গানে টান দেয়, এতে তাদের স্বভাবচরিত্র খারাপ হইয়া যায়।*"[৮]

রূপে-রসে-গন্ধে ভরপুর ছিল মালো সংস্কৃতি। কিন্তু সেই সমৃদ্ধ ভাণ্ডারও যেন বিষাক্ত কীটের দংশনে ধীরে ধীরে নিঃশেষিত হয়ে যায়। পূজা-পার্বণে, জন্ম-মৃত্যু-বিবাহে জীবনে চলার পথে মালোরা নিজেদের সংস্কৃতিকে মান্য করে চলত। মালো ছাড়া অন্য কেউ এ সংস্কৃতির ভিতর প্রবেশ করতে পারত না। যাত্রাগানের দল মালোদের সংস্কৃতিকে কুঠারাঘাত করে। পরিণামস্বরূপ মালো ছেলেরা হুকা ছেড়ে সিগারেট ধরল, গুরুজনদের প্রতিও তেমন শ্রদ্ধা ভক্তি নেই, রোজগারের দিকে কোনো খেয়াল নেই। উচ্চবর্গের ব্যবিচার দৃষ্টিকটু হওয়া সত্ত্বেও মালোদের প্রতিবাদ করার কোনো সাহস নেই। নতুনের চটকে মালোরা নিজের ইজ্জত আবরু বিসর্জন দিল। তার উপরি লোন কোম্পানির চক্রবৃদ্ধি সুদের বোঝা শোধ করতে করতে মালো সমাজের মেরুদণ্ড একেবারে ভেঙ্গে গেল। মালোরা সর্বস্ব হারিয়ে পথে বসে মৃত্যুর অপেক্ষায় দিন গুণতে থাকে।

তিতাসের বুকে জেগে ওঠা চর নিয়ে মালোদের মধ্যে বিবাদের সৃষ্টি হয়। রামপ্রসাদ নিজের বাড়ির সোজাসুজি জেগে ওঠা চরকে দখলে আনার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে। শুধু রামপ্রসাদই নয় করমআলি বন্দেআলি প্রভৃতি ভূমিহীন চাষাও এসেছিল কিন্তু কারো ভাগ্যে একটুকরোও মাটি আসেনি। তিতাসের বুকে জেগে ওঠা চরকে তারাই আয়ত্তে আনতে সক্ষম হয় যারা প্রচুর মাটির সত্ত্বাধিকারী, যারা বলবান, যারা অর্থশালী। আর তিতাস নদী শুকিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মালোদের অবস্থা একেবারে জল ছাড়া মাছের মত হয়। খেতে না পেয়ে মালোরা শুধু মৃত্যুর অপেক্ষায় আছে। মালোদের দুর্দশার কাহিনি ব্যক্ত করতে গিয়ে কথাকারের হৃদয়বিদারক বক্তব্য,-"*অনেক মালো পরিবার গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। যারা আগেই গিয়াছে তারা ঘরদুয়ার জিনিসপত্র নৌকাতে বোঝাই করিয়া লইয়া গিয়াছে। যারা পরে গিয়াছে তারা ঘরদুয়ার জিনিসপত্র ফেলিয়াই গিয়াছে। তারা কোথায় গেল যাহারা রহিয়া গিয়াছে তারা জানিতেও পারিল না। তারা কতক গিয়াছে ধান কাটায়, কতক গিয়াছে বড় নদীর পারে। সেখানে বড় লোকেরা মাছ ধরার বড় রকমের আয়োজন করিয়াছে। মালোরা যেখানে খাইতে পাইবে আর নদীতে তাদের হইয়া মাছ ধরিয়া দিবে।*

যারা দলাদলি করিয়াছিল, মাছ ধরা বন্ধ হইয়া যাওয়ায় বাজারে পালেরা তাদের দয়া করিয়া কাজ দিয়া দিল, শহর হইতে তাদের জন্য মালের বস্তা ঘাড়ে করিয়া দোকানে আনিয়া দিবে আর রোজ-চার আনা করিয়া পাইবে। সেই সব বস্তা বহিতে বহিতে তাদের কোমর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তারা এখন বেঁকা হইয়া পড়িয়াছে। কাজ করিতে না পারিয়া তারা এখন কেবল মরিবার অপেক্ষায় আছে।"[৯] তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে জেলে সমাজের চিত্রায়ণে অন্যান্য ঔপন্যাসিকের কারুকার্য মোটামুটি একই। বংশানুক্রমে যারা চিরলাঞ্ছিত, অবহেলিত, উৎপীড়িত, শোষিত, বঞ্চিত, দুর্বল, নিরুপায়, অখ্যাত, উপেক্ষিত, ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজব্যবস্থার যাঁতাকলে যারা নিষ্পেষিত, কোনোদিন স্বচ্ছলতার বোধ যাদের মধ্যে জন্মায়নি –এই নিম্নবর্গীয় মালো সমাজের মধ্যে নৈতিকতাবোধের আশা করা অন্যায়। অদ্বৈত মল্লবর্মণ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে, হৃদয়ের মর্মব্যথাকে উজাড় করে, অশ্রুজলে সিক্ত করে জেলেদের জীবনযাত্রা বর্ণনায় প্রয়াসী হয়েছিলেন। তাই সবদিক দিয়ে বিচার করলে, উপন্যাসের গঠন শৈলীর মাপকাঠিকে একদিকে রেখে আমরা একথা দাবী করে বলতে পারি তাঁর চিত্রিত চরিত্র ও সমাজজীবনের বাস্তবায়নে তিনি মৃত মানুষের মধ্যেও প্রাণরসের সঞ্জীবনী ধারাকে প্রবাহিত করতে সক্ষম হয়েছেন।

সূত্র নির্দেশ:

১। চক্রবর্তী, বিমলঃ 'অদ্বৈত মল্লবর্মণ ব্রাত্য জীবনের ব্রাত্য কথাকার', প্রথম প্রকাশ, আগষ্ট ২০১২, অক্ষর পাবলিকেশনস্, ত্রিপুরা -৭৯৯০০১, পৃ, ২৬
২। 'অদ্বৈত মল্লবর্মণ রচনা সমগ্র'-সম্পাদনাঃ অচিন্ত্য বিশ্বাস; প্রথম প্রকাশঃ জানুয়ারি ২০০০, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা -৭০০০৭৩, পৃ, ৪০২
৩। তদেব, পৃ, ৫৫২
৪। তদেব, পৃ, ৪৬০
৫। তদেব, পৃ, ৪৪৫
৬। তদেব, পৃ, ৪৫৩
৭। তদেব, পৃ, ৫৩১
৮। তদেব, পৃ, ৫৪৪
৯। তদেব, পৃ, ৫৫৯